উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

মোহাম্মদ ফরহাদ

প্র কা শ ন

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
মোহাম্মদ ফরহাদ
প্রচ্ছদ: মিতা মেহেদী

প্রকাশক: দ্যু প্রকাশন
দ্বিতীয় মুদ্রণ: মাঘ ১৪৩১, জানুয়ারি ২০২৫
প্রথম দ্যু প্রকাশ: মাঘ ১৪২৫, জানুয়ারি ২০১৯
প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ১৯৮৯, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

Unasattarer Gana-abhyutthan
[THE MASS UPSURGE OF 1969]
By Muhammad Farhad
Cover Designed by Mita Mehedi
First Published: December 1989, Jatiya Sahitya Prakashani, Dhaka
First Dyu Published: January 2019
Second Print: January 2025 by Dyu Publication

www.dyu.com.bd
ISBN: 978-984-99114-1-8
Printed & Bound in Bangladesh

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form, of by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written permission of the author and publisher, except where permitted by law.

দ্বিতীয় সংস্করণ
আরও কিছু কথা

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দ্যু প্রকাশন কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদের লেখা বইটি আবার ছাপানোর প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের তরুণ সমাজ এ বইটি থেকে সে যুগ আর এ যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে। আমাদের চিন্তার একটি নতুন জানালা খুলে গেল। ৫০ বছর আগে আমরা কোথায় ছিলাম, আজ কোথায় আর কতদূর যেতে হবে—এসব যাচাই করে দেখার খোরাক বইটিতে আছে।

১৯৬৯ সালের পর সবচেয়ে বড় ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল ১৯৯০ সালে। সেটা ছিল মূলত এরশাদ সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য। এরপর আবার ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে—এ কয়েক মাস শাহবাগ চত্বরে অভাবনীয় ছাত্র-গণজাগরণ পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সেটা ছিল যুদ্ধাপরাধের বিচার নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করার জন্য।

তিনটি অভ্যুত্থানই ছিল সফল। আমাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার বিকাশে এ তিনটি গণঅভ্যুত্থানের স্থায়ী প্রভাব আমরা সবসময়ই অনুভব করি।

এর আগে বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন ও ছেষট্টির ৬ দফা আন্দোলন আমাদের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছে।

এ বইটি মূলত পূর্ববাংলার (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ ফরহাদের লেখা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কয়েক মাসব্যাপী ছাত্র-তরুণ দেশবাসীর অভাবনীয় সাহসিকতাপূর্ণ আন্দোলনের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পরিস্থিতির একটি বাস্তবানুগ তথ্য ও বিশ্লেষণমূলক বিবরণ তুলে ধরাই ছিল এর উদ্দেশ্য। সে সময় মোহাম্মদ ফরহাদ ছিলেন ছাত্র সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বে। পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) ছাত্র ইউনিয়নের মূল নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কাজ করতেন। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল বেআইনি। মোহাম্মদ ফরহাদ আত্মগোপনে থেকে কাজ করতেন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা করা এবং কখন কী করতে হবে, করণীয় নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে মোহাম্মদ ফরহাদের ছিল অসাধারণ দক্ষতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র-জনতার মৌলিক আর্থসামাজিক দাবী যুক্ত করে ১১ দফা আন্দোলনের সূচনা ঘটানোর পেছনে তাঁর বুদ্ধি-পরামর্শ বিশেষ অবদান রেখেছিল।

ঊনসত্তরের ২৪ জানুয়ারির গণঅভ্যুত্থানের পরপরই কারফিউ ও দমন-পীড়নের কারণে আন্দোলন আপাত স্তিমিত হয়ে পড়লেও সেটা যে থেমে যায়নি এবং যাবে না, বরং আরও ব্যাপক ভিত্তিতে দেশব্যাপী প্রসারিত হবে তার বাস্তবসম্মত কারণ তিনি তাঁর বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করেন। সামরিক জান্তা আইয়ুব

শাহীর অনিবার্য পতনের কথা তিনি সেখানে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

প্রায় মাসখানেক বিরতিতে চলে আসে মহান একুশে। তখন ঢাকায় চলছিল কারফিউ। ছাত্রনেতারা আলটিমেটাম দেয়, ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার মধ্যে কারফিউ উঠিয়ে নিতে হবে। জনগণকে সন্ধ্যায় শহীদ মিনারে জমায়েত হয়ে মশাল মিছিলে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এরপর নামে ছাত্র-জনতার ঢল। কারফিউ ভেসে যায়।

গণঅভ্যুত্থানের প্রধান সাফল্য ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কমরেড মণি সিংহ, মতিয়া চৌধুরীসহ রাজবন্দিদের মুক্তি, আইয়ুবের পতন, সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা প্রভৃতি।

ঊনসত্তরের পয়লা মে, মহান মে দিবসে কমিউনিস্ট পার্টির একটি গোপন ঘরোয়া সমাবেশে কমরেড মণি সিংহ উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, "২৪ জানুয়ারির মহান গণঅভ্যুত্থান হলো 'আগামী বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সেল'!" সে সময় আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থী। তাঁর সেই ভাষণ আমাদের দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করে।

সেই বিপ্লব ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা।

শুধু ইতিহাস জানার জন্য নয়, বইটি আজকের তরুণ সমাজের পড়া দরকার বিশেষভাবে কোনো রাজনৈতিক ঘটনা বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য। আজ রাজনীতি অনেক জটিল। স্বাধীনতার সময়ের রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস ও কাজের পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করছে। এ যুগে সমাজ ও মানুষের চিন্তা-ভাবনায় এসেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। এ সময়

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বইটি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে পদ্ধতিগত নতুন মাত্রা যোগ করবে।

বইটি দ্বিতীয় মুদ্রণ মাত্র। বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হয়নি, পূর্বের বানানরীতিও অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। দ্যু প্রকাশন বইটি পুনর্মুদ্রণ করে সময়ের দাবী পূরণ করল।

আব্দুল কাইয়ুম মুকুল
জানুয়ারি ২০১৯

প্রথম প্রকাশ
প্রকাশকের নিবেদন[১]

প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ-এর বর্তমান গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ঊনসত্তর সালের শেষাশেষি। আপাতদৃষ্টিতে গণঅভ্যুত্থান তখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, পুনরায় জারী হয়েছে সামরিক শাসন, গণঅভ্যুত্থান অন্তঃশীলা যে পরিবর্তন দেশে বয়ে এনেছে তা তখন প্রায় দুর্লক্ষ্য। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে গণঅভ্যুত্থানের একটি মূল্যায়ন হিসেবে এই রচনা দাখিল করেছিলেন মোহাম্মদ ফরহাদ। আলোচনাকালে এর কিছুটা পরিমার্জনাও করেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাধীনতার জীবন-মরণ লড়াইয়ের রক্তক্ষয়ী পর্বে আরো বহু কিছুর সঙ্গে এই মূল্যায়নও হারিয়ে গেছে বলে ভাবা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে পুরনো নানা কাগজপত্রের ভেতর এই পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান মোহাম্মদ ফরহাদ-এর সতীর্থ অনুজকর্মী শেখর দত্ত। এর পর থেকেই এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশে আমরা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। রচয়িতার নানামুখী কর্মব্যস্ততার কারণে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে এর চূড়ান্ত ভাষ্য প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল লেখকের অপর অনুজপ্রতিম সহকর্মী আব্দুল কাইয়ুম মুকুলের ওপর। যে পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে তার

১. জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৯, প্রথম প্রকাশকালে প্রকাশকের ভূমিকা।—বর্তমান সংস্করণ সম্পা.

রচনাকালের সব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে মূলত ভাষাগত দিক দিয়েই এই সম্পাদনা সম্পন্ন করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে তৎকালে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল এই মূল্যায়ন। চলিত ভাষায় এর রূপান্তর করেছেন সম্পাদক।

আমাদের রাজনীতি যখন বড় বেশি তাৎক্ষণিকতা আক্রান্ত, উচ্ছ্বাসের যত প্রাবল্য গভীরতাশ্রয়ী বিশ্লেষণ সেই তুলনায় প্রায় সম্পূর্ণাংশে অনুপস্থিত তখন এই গ্রন্থ চিন্তা ও চেতনার জগতে একটা নতুন ঢেউ জাগাতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এমনি একটি গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব নির্বাহ করতে পেরে আমরা গর্ব অনুভব করি। সেই সঙ্গে পরম বেদনাহত হয়ে উঠি এ কথা ভেবে, গ্রন্থ প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে লেখক আর আমাদের মধ্যে নেই। মৃত্যু এসে যে আকস্মিক বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী করে তুলেছে কর্মের ধারাতেই তা মোচন সম্ভব। এখানেই আমাদের সান্ত্বনা। লেখকের কর্ম-পরিচয়ের একটি অনুপম অধ্যায় বিধৃত হয়ে রইল এই গ্রন্থে।

মফিদুল হক
১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

প্রথম প্রকাশ
সম্পাদকের কথা

আমাদের দেশে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মতো আর একটি ঘটনা পূর্বাপর আর কখনও ঘটেনি। অথচ এই মহান গণঅভ্যুত্থানের বিশাল কর্মযজ্ঞের অভ্যন্তরে রাজনীতির পাঠ গ্রহণকারীদের জন্য যে-ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে, তা আজও পর্যন্ত কেউ উদ্‌ঘাটন করেননি। বর্তমান লেখায় এর খোরাক রয়েছে।

গণঅভ্যুত্থানের একটি সামগ্রিক পর্যালোচনামূলক রির্পোটের খসড়া প্রণয়নের জন্য ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদকে দায়িত্ব দেয়। তিনি সে-সময় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে ছাত্র আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। গণঅভ্যুত্থানের দৈনন্দিন ঘটনাবলির ভিত্তিতে তথ্যবহুল ও গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণসমৃদ্ধ মোহাম্মদ ফরহাদ রচিত খসড়া পর্যালোচনা-রিপোর্টটি পরবর্তী সময়ে কিছু সংশোধনীসহ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রহণ করে।

কিন্তু প্রায় দুই যুগ পর সে-সময় সংশোধিতরূপে গৃহীত রির্পোটের কপি আর পাওয়া যায়নি। তাই মোহাম্মদ ফরহাদের লিখিত খসড়া রিপোর্টটিই আজ দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করা

হলো এই আশা নিয়ে যে, আমাদের দেশবাসী অতীতে সামরিক স্বৈরাচারের অবসান ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে অসীমসাহসিক আন্দোলনের অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তার নিবিড় পরিচয় লাভ করে দেশবাসী পাবে নতুন উদ্দীপনা, গণতন্ত্র ও প্রগতির শক্তি পাবে নতুন রাজনৈতিক শিক্ষা।

গণঅভ্যুত্থানের পর্যালোচনা রিপোর্টটি বর্তমানের উপযোগী করে প্রকাশের উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ ফরহাদ ১৯৮৬ সালে সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সম্পাদনা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। গ্রন্থের 'গোড়ার কথা' অধ্যায়টি তিনি ১৯৮৬ সালে নিজেই সংযোজন করে গেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলো ১৯৬৯ সালেই লেখা। তাই এই অংশে যেসব স্থানে 'আজ' বা 'এখন' লেখা হয়েছে, তা বোঝাচ্ছে ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সময়কাল। এই অধ্যায়গুলো তিনি নিজে সম্পাদনা করে যেতে পারেননি। তবে বিভিন্ন সময় তাঁর লেখার কিছু কিছু স্থানে সম্পাদনার কথা তিনি আলোচনা করে গেছেন। সে ভিত্তিতে কিছু সম্পাদনা করে উক্ত পর্যালোচনা রিপোর্টটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

আব্দুল কাইয়ুম মুকুল

সূচিপত্র

গোড়ার কথা	১৫
গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি	২৫
পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন শুরু	৩৬
পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া	৩৯
কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্য-নীতি	৪৫
পূর্ব বাংলায় হরতাল এবং গণ-আন্দোলন শুরু	৪৯
নতুন অভিজ্ঞতা	৫৫
সংযুক্ত বিরোধী দল	৫৭
১৩ ডিসেম্বরের হরতাল	৬০
ঐক্যজোট ও গণ সংগ্রামের নবতর পর্যায় শুরু	৬৫
ঐক্যজোট ও 'ডাক' গঠন	৬৯
ছাত্রসমাজ ও ঐতিহাসিক ১১-দফা	৭৩
ছাত্রদের আন্দোলনের প্রস্তুতি	৭৬
২৪ জানুয়ারির মহান অভ্যুত্থান	৮৭
গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে পার্টির নীতি	১০৪
শপথ দিবসে পল্টনে ঐতিহাসিক জনসভা	১১৪

১৪ ফেব্রুয়ারি নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক
ঐতিহাসিক আম-হরতাল ১১৭
আগরতলা মামলার বন্দীদের ওপর গুলিবর্ষণ ১২১
২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ১২৯
শ্রমিক ও কর্মচারীদের ঘেরাও আন্দোলন ১৩৮
মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগ ১৪৫
৪ মার্চের হরতাল ১৫২
মার্চ মাসের গোলটেবিল বৈঠক ১৫৬
গোলটেবিল পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা ও সামরিক শাসন ১৬৮
গণঅভ্যুত্থানে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ১৭৬
গণঅভ্যুত্থানে অন্যান্য পার্টির ভূমিকা ১৯১
সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে ২০২
গণঅভ্যুত্থানের শক্তি, দুর্বলতা ও বৈশিষ্ট্য এবং
এর চরিত্র ও নেতৃত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে ২০৬

গোড়ার কথা

৭ অক্টোবর ১৯৫৮। খুব ভোরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন কমরেড আসলেউদ্দিন। তিনি আমার চাইতে বয়সে বড়। তিনি আমাকে বললেন, 'খবর শুনেছ? সারা পাকিস্তানে মার্শাল ল জারী হয়েছে! ইসকেন্দার মীর্জা প্রেসিডেন্ট আছেন, কিন্তু জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রধান হয়েছেন।'

পাকিস্তানে মার্শাল ল হবে কি হবে না, সে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক চলছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশশাসিত উপনিবেশ হিসেবেও ন্যূনতম কতক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটেছে। কাজেই পাকিস্তানে মার্শাল ল হবে না। এসব ঘটনা নাকচ করে পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন কায়েম হয়ে বসল। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান তার অসৎ কাজের সঙ্গী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসকেন্দার মীর্জাকে তাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতায় একনায়ক হয়ে বসে। ২৫ মার্চ ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের লৌহ-মানব হিসেবে পরিগণিত সামরিক ডিক্টেটর আইয়ুব ক্ষমতায় ছিল। আইয়ুব যেদিন ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেদিন সারা পাকিস্তানের মানুষ আনন্দ-উৎসব করেছে। সব ডিক্টেটর যেভাবে একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, আইয়ুবের ভাগ্য তা থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না।

কিন্তু যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আইয়ুব পাকিস্তানের ক্ষমতায় এসেছিল, সে সময় কেবল পশ্চিম পাকিস্তানেই নয়, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানেও জনগণের একাংশের মধ্যে অনুকূল পরিস্থিতি লাভ করেছিল। এটার কারণ ছিল এই যে, সে সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রে ঘন ঘন সরকার বদল ঘটছিল। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পূর্ব বাংলায় বসে কখনই অনুভব করা যেত না। বরং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সংকটের বোঝা দিনে দিনে বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত ছিল। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা সংগ্রামের পটভূমিতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ মোর্চা—যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল। তদানীন্তন তিন প্রধান নেতা হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁদের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের কবর রচনা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে নস্যাৎ করার জন্য ৯২ (ক) ধারা, তথা গভর্নর শাসন কায়েম করেছিল। এরপর এক বছরের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গিয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী-মুজিব এবং ফজলুল হক-আবু হোসেন সরকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন।

৯২ (ক) ধারা প্রত্যাহার হওয়ার পরে আবু হোসেনকে মুখ্যমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু সংসদের অভ্যন্তরে হাঙ্গামায় স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম নৈরাজ্য, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। মানুষ এই অবস্থার অবসান কামনা করছিল। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে, জনগণের নিস্পৃহ মনোভাবের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী জেনারেল আইয়ুবকে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। শুরু হয় আইয়ুবী শাসনের কালো যুগ।

কিন্তু আইয়ুবী শাসন কি পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনো স্থিতিশীলতা আনতে পেরেছিল? আইয়ুবের ক্ষমতা দখলের মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যেই আইয়ুবী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। দাবানলের মতো ছাত্র গণ-আন্দোলন পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের সামরিক ডিক্টেটর আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে ১৯৬২ থেকে যে অগ্নি-ক্ষরা, রক্ত-ঝরা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ছিল সে সংগ্রামেরই চূড়ান্ত রূপ। এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়েই সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে দেশবাসী একচেটিয়া রায় দিয়েছিল জাতীয় অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এবং এই রায়কে বাস্তবায়নের জন্য জাতি এগিয়ে গিয়েছিল ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে। আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে হলে অবশ্যই শুরু করতে হবে গোড়া থেকে—১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে। অথবা, আরও আগে থেকে। সে ইতিহাস সমগ্রে এখানে যাওয়া হচ্ছে না। এখানে একটি বিশেষ আন্দোলন সম্পর্কেই আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে—১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

সাধারণভাবে বলা হয়, ১৯৪৮ থেকেই আমাদের এদেশীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা। কিন্তু আরো স্পষ্ট ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়, ১৯৫২ সালের মহান ভাষা সংগ্রামই হল আমাদের জাতীয় চেতনার বিপ্লবী প্রকাশের প্রথম বিস্ফোরণ। তাই মহান 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বাঙালি জাতি কখনও বিস্মৃত হবে না। 'একুশে'-র সংগ্রামে রক্ত ঝরেছিল, দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। এটাই ছিল এ-দেশের (পাকিস্তান হওয়ার পর) গণমানুষের প্রথম

সার্থক সংগ্রাম। সার্বিক কারণে ২১ ফেব্রুয়ারি অনন্য একটি দিন হিসেবে চির-ভাস্বর থাকবে। এসব কারণে একুশের সঙ্গে তুলনা করার কিছু নেই। কিন্তু ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান?

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মত আর একটি ঘটনা আগেও না, আজও না—আর কখনও ঘটেনি। এই অভ্যুত্থান আইয়ুবের মত 'লৌহ-মানব' ডিক্টেটরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ছেড়ে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত সৃষ্টি করেছিল। এই অভ্যুত্থানের জঙ্গীপনা, ব্যাপকতা, তীব্রতা, ক্ষীপ্রতা সবই ছিল অনন্য সাধারণ ঘটনা। এটা ছিল পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম। কয়েক বছরের একটানা লাগাতার রাজনৈতিক লড়াইয়ের চূড়ান্ত হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল এই গণঅভ্যুত্থান। এই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের সংক্ষেপে এই হলো গোড়ার কথা।

পাকিস্তান সৃষ্টি করার পর পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে মুসলিম লীগ গোড়ার দিকে যখন একচেটিয়া নেতৃত্বে ছিল, সে সময়েও তারা পাকিস্তানের সংবিধানের প্রশ্নটি ফয়সালা করতে পারেনি। পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে—তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে তারা কিভাবে সমাধান দেবে, ঠিক করতে পারছিল না। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, তথা সার্বিক কারণে খুব দ্রুতই তারা জনপ্রিয়তা ও গণভিত্তি হারিয়ে ছিল, বিশেষত তদানীন্তন পূর্ব বাংলায়—যা আজকের বাংলাদেশ। ১৯৫২ সালের মহান সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় তাদের প্রভাব ও ভিত্তি, বলা যায়, সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসন পেয়েছিল। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এতে ভীত হয়ে দমননীতির পথ গ্রহণ করেছিল।

বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ৯২ (ক) ধারার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসন চালু করা হয়। এই সময় তারা কেন্দ্রে সংবিধান রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'গণপরিষদ' ভেঙে দিয়েছিল। আর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে ভেঙে দিয়ে 'এক ইউনিট' অর্থাৎ 'পশ্চিম পাকিস্তান একটি প্রদেশ' গঠন করেছিলেন। এগুলো আসলে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতিকে মোকাবেলা করার অপচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ১৯৫৫ সালে পরোক্ষ ব্যবস্থায় আর একটি গণপরিষদ নির্বাচন করে দ্রুতই একটি সংবিধান রচনা করা হয়েছিল। এই সংবিধান বাঙালিরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট জাতিগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিল। কারণ এদেশে না ছিল জাতীয় স্বায়ত্তশাসন, না ছিল গণতন্ত্র। তা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে যখন সারা পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা উঠেছিল—সে সময় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আইয়ুব খান সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতা হস্তগত করে নেয়। সংবিধান, মৌলিক অধিকার, রাজনৈতিক তৎপরতা ও দল করার অধিকার—সব বাতিল করা হয়। গণতন্ত্রী, বিশেষত প্রগতিশীল ও কমিউনিস্টদের ওপর দমননীতি চলে। সে সময় পূর্ব বাংলায় আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য বা গোপন কোনো তৎপরতা ছিল না। আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে নতুন ধরনের সংবিধান চালু করবে বলে শোনা যাচ্ছিল। আইয়ুবের কথা মতে 'এ দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও মেধা' অনুযায়ী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার কেটে দিয়ে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছিল। জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের কোনো প্রশ্নই নেই, সংসদীয় গণতন্ত্র বাতিল করে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির

একনায়কত্বমূলক সরকার স্থায়ীভাবে কায়েম করা হবে বলে শোনা যাচ্ছিল। এ-ছাড়াও আইয়ুব শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, কৃষি ও ভূমি সংস্কার প্রভৃতি অনেক সংস্কারমূলক নীতিই ঘোষণা করেছিল। বলা বাহুল্য, এসব কিছুই ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থ-বিরোধী। যেমন ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আইয়ুব ধনীদের জন্য জমির সিলিং বৃদ্ধি করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে সেদিনের ছাত্র সমাজ আইয়ুব-সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। ১৯৬১ সাল থেকেই সে সময় কমিউনিস্ট ও আওয়ামী লীগ নেতারা (মণি সিংহ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) গোপনে দু-একবার আলোচনা-পরামর্শ বৈঠকও করেন। এই সামান্য রাজনৈতিক নড়াচড়া টের পেয়ে আইয়ুব ৩০ জানুয়ারি ১৯৬২ সালে করাচিতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। এই ঘটনা ঢাকায় বারুদ হয়ে ওঠা ছাত্র সমাজের মধ্যে ইগনিশনের কাজ করে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় অগ্নি-ক্ষরা আন্দোলন। ১৯৬২ সালেই সামরিক শাসন প্রত্যাহৃত হয়, জনাব সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক রাজবন্দীও মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু আইয়ুব 'জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও মেধা' অনুযায়ী তার পছন্দমত সংবিধান জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে যায়। সে সময় থেকে বলা যায়, নিরবচ্ছিন্নভাবেই আন্দোলন চলে আসছিল। তবে সবসময়ে তীব্রতা এক ছিল না। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ১৯৬২ সালেই মুক্তিলাভ করে সেপ্টেম্বরে ঢাকায় আসেন। তিনি নীতি গ্রহণ করেছিলেন যে, রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনরুজ্জীবিত না করে সবাই মিলে 'গণতন্ত্র উদ্ধার'-এর জন্য প্রচার আন্দোলন চলুক। তিনি, সে সময়, ছাত্রসমাজের জঙ্গী সংগ্রাম আর খুব বেশি অগ্রসর হোক—সেটা পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু সে সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিরাট বিরাট জনসভা সত্ত্বেও 'গণতন্ত্র

উদ্ধার' করা যায়নি। ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে আইয়ুব মৌলিক গণতন্ত্রীদের নির্বাচন দেয়। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরাই ১ জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। ইতোমধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব ইন্তেকাল করেন। পূর্ব বাংলায় ছাত্র-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবীদের নানা রকম আন্দোলন অবশ্য অব্যাহত ছিল। এই সময়কালের মধ্যে বামপন্থী শিবিরে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিভেদ শুরু হয়।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৬২ সালে আইয়ুব-বিরোধী সংগ্রামের সূচনার মধ্য দিয়ে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি, বামপন্থী ন্যাপ ও ছাত্র সমাজের মধ্যে বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবং তারাই আন্দোলনের অনেকটা চালিকা-শক্তিতে পরিণত হওয়ার অবস্থায় যাচ্ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মাওবাদীদের হঠকারী ও বিভেদাত্মক কার্যকলাপের জের মাওবাদীরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও টেনে আনে। প্রথম ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত করে তারা স্বতন্ত্র ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করে। পরবর্তীকালে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বের হয়ে তারা মাওবাদী পার্টি গঠন করে। মাওবাদীরা হঠকারীভাবে 'নকশালবাড়ি' নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করে। এর দ্বারা আইয়ুব-বিরোধী গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা খর্ব হতে থাকে। ১৯৬২ সালের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ-দেশের জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় বাম-উপাদান বিকশিত হওয়ার যে-সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা অঙ্কুরেই এইভাবে বিনষ্ট হয়।

১৯৬৪ সালে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচনে পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব-বিরোধী ব্যাপক